Islami Ain O Bichar
Vol. 20, Issue: 79 & 80
July-Sept., Oct.-Dec. 2024

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2025-02-08
Published: 2025-03-19

DOI: https://doi.org/10.58666/iab.v20i79-80.284

Secondary Level Textbooks And Examination Methods In The National Curriculum 2012 And 2021: A Review

Muhammad Nasir Uddin* Syed Md. Mahbub Zabiry**
Muhammad Mofazzal Hossain Rasel*** Md. Mohi Uddin****

Abstract

A controversy has arisen over the textbooks prepared under the National Curriculum of 2021 in Bangladesh. It is evident that Islam and Islamic culture have been distorted very tactfully in the textbooks. Madrasa students are being taught to play the tabla, dance and music. Muslims are being criticized for their beards. Biographies of Muslim schola Examination Methods In The National Curriculum 2012 And 2021 Examination Methods In The National Curriculum 2012 And 2021rs and poems of Muslim poets have been excluded from the textbooks. Confusion has been created in the minds of students about science. The moral foundation of children is being undermined by incorporating heinous subject like transgender through the stories of Sharif-Sharifa. B Examination Methods In The National Curriculum 2012 And 2021oys and girls of 11-12 years are being taught about the physical structure of men and women, menstruation, ejaculation, etc. It can also be seen that the entire education system has been made ineffective by adding unnecessary subjects. Books are being prepared under the name of Life and Livelihood and are being taught to cook rice, fry eggs, make potato stew, etc. Although there are descriptions of different cultures of different religions under the name of Art and Culture, Islamic culture has been very consciously omitted.

The research has identified such controversial and conflicting topics at the secondary level and presented the comments and recommendations of the researchers in this regard. The research has analyzed and reviewed the existing data and presented the results using the descriptive and analytical method. Since there has been no previous work on this subject, this is a completely new and fundamental research. Due to this reason no information is available to review the literature. By going through the article, a reader will be informed about the controversial topics that were included in the secondary level textbooks in the education system of Bangladesh during the authoritarian regime of past dictator and will be able to appreciate the effectiveness of the comments and recommendations provided by the researchers.

Keywords: Bangladesh, textbooks, examination system, curriculum.

* Muhammad Nasir Uddin, PhD Researcher, Department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka-1100. e-mail: nasirjnuis@gmail.com
** Syed Md. Mahbub Zabiry, Assistant Professor (Arabic), Haidergonj Taheria R M Kamil Madrasah, Raipur, Laskmipur.
*** Muhammad Mofazzal Hossain Rasel, PhD Researcher, Department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka-1100.
**** Md. Mohi Uddin, Post Graduate Researcher, Department of Arabic, University of Dhaka-1000.

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ ও ২০২১ এ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ও পরীক্ষা পদ্ধতি : একটি পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ এর অধীনে প্রণীত পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোতে দেখা যায়, খুব সতর্কতার সাথে ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতিকে বিকৃত করা হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার্থীদেরকে শেখানো হচ্ছে তবলা বাজানো, নাচগান। মুসলমানদের দাঁড়ি নিয়ে কটূক্তি করা হচ্ছে। মুসলিম মনিষীদের জীবনী, মুসলিম কবিদের কবিতা পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞান নিয়ে শিক্ষার্থীদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। ট্রান্সজেন্ডারের মতো জঘন্য বিষয়কে শরীফ-শরীফার গল্প দিয়ে শিশুদের নৈতিক ভিত্তি ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১১-১২ বছরের ছেলে মেয়েদেরকে শেখানো হচ্ছে নারী পুরুষের শারীরিক গঠন, ঋতুস্রাব, বীর্যপাত ইত্যাদি। আরও লক্ষ্য করা যায়, অপ্রয়োজনীয় বিষয়াবলি সংযুক্ত করে পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকেই অকার্যকর করা অপচেষ্টা কর হয়েছে। জীবন ও জীবিকার নামে শেখানো হচ্ছে ভাত রান্না, ডিম ভাজা, আলু ভর্তা করা ইত্যাদি। শিল্প ও সংস্কৃতি নামে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন সংস্কৃতির বর্ণনা থাকলেও ইসলামী সংস্কৃতি বাদ দিয়ে ইসলাম বিদ্বেষ ছড়ানোর অপচেষ্টা করা হয়েছে।

বক্ষ্যমাণ গবেষণাটিতে মাধ্যমিক স্তরের এমন বিতর্কিত ও ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়াবলি চিহ্নিত করে এ ব্যাপারে গবেষকদের মন্তব্য ও সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণাটিতে বিদ্যমান তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে ফলাফল উপস্থাপনে বর্ণনামূলক পদ্ধতি (descriptive method) ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি (analytical method) অনুসরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পূর্বে আর কোন কাজ না হওয়ায় এটা সম্পূর্ণই নতুন ও মৌলিক একটি গবেষণা। যার কারণে সাহিত্য পর্যালোচনা করার মতো কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। প্রবন্ধটি পাঠের মধ্য দিয়ে একজন পাঠক বিগত স্বৈরশাসনামলে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে যেসব বিতর্কিত বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত ছিল সেগুলো সম্পর্কে অবহিত হবেন এবং গবেষকদের দেওয়া মন্তব্য ও সুপারিশগুলোর কার্যকারিতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

মূলশব্দ: বাংলাদেশ, পাঠ্যপুস্তক, পরীক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষাক্রম।

ভূমিকা

শিক্ষার্থীদের জীবনে পাঠ্যপুস্তক একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ উপাদানের কার্যকারিতা শিক্ষার্থীদের মানসিক বৃদ্ধি, উন্নত মানুষ তৈরি এবং নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন জাতি গঠনে স্বপ্ন দেখাটা কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে। বাংলাদেশের কতিপয় শিক্ষাবিদ অন্যদেশের কারিকুলাম দেখে অবিকল সেটা নিজের দেশে বাস্তবায়ন করতে চায়। কথিত শিক্ষাবিদদের এটা বুঝা উচিত যে দেশ, সভ্যতা, ধর্ম, সংস্কৃতি ভেদে শিক্ষাব্যবস্থাটা ভিন্ন হয়। বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ মানুষ মুসলমান। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে এটা খেয়াল রাখা গুরুত্বপূর্ণ। পাঠ্যপুস্তকে এমন কিছু বিষয় সংযুক্ত করা যাবে না, যা সরাসরি ইসলামী নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কয়েকটি ধারায় বিদ্যমান যেমন: কওমী, আলিয়া, জেনারেল (স্কুল)। একজন স্কুলের শিক্ষার্থীর জন্য যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হবে, হুবহু সেই পাঠ্যপুস্তক মাদরাসা শিক্ষার্থীর জন্য হতে পারে না। মাদরাসাতে প্রায় শতভাগ শিক্ষার্থী মুসলিম ধর্মাবলম্বী, যেটা জেনারেল শিক্ষায় অনুপস্থিত। বাদ্যযন্ত্র বাজানো, কার্টুন আঁকা, ভাস্কর্য তৈরির পদ্ধতি মাদরাসা শিক্ষার্থীদের শেখানোর চেষ্টা তাদের প্রতি উপহাসের নামান্তর।

পাঠ্যপুস্তকগুলো দেখলে মনে হয়, স্যেকুলার শিক্ষাবিদরা খুব সতর্কতার সাথে মুসলিম সংস্কৃতির উপর আঘাত করেছে। যা একজন মুসলিম শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য মেনে নেওয়া কষ্টকর। আবার এমন অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদি সংযুক্ত করা হয়েছে, যা ২০২১ সালের প্রণীত পাঠ্যপুস্তকে সংযোজন করা অযৌক্তিক। এসব অযাচিত বিষয়াদি বাদ দিয়ে আমাদের মানসম্মত শিক্ষার প্রতি মনযোগ দিতে হবে, যেন নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন জাতি গঠনে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি ও পাঠ্যপুস্তক কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

আমরা পূর্বেকার পাঠ্যপুস্তকে এতোটা সমালোচিত ও ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়াদি লক্ষ্য করিনি। অনেকেই আমরা মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে বিতর্কিত বিষয়াবলির কথা শুনেছি কিন্তু আসলে কোন কোন বিষয়াবলি বিতর্কিত তা আমাদের কাছে অস্পষ্ট হওয়ায় এই গবেষণার প্রয়োজন অনুভূত হয়। একইসাথে বর্তমানে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ বাতিল ঘোষণা করে পুরাতন শিক্ষাক্রমের পাঠ্যপুস্তক যৎসামান্য পরিবর্তন করে পুনঃমুদ্রণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে পূর্বতন শিক্ষাক্রম বাতিল করতঃ বর্তমানে পূর্বতন জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুসরণে প্রণীত পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হলেও মূল্যায়ন প্রদ্ধতিতে শিক্ষাক্রম ২০১২ পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়নি; বরং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী একটি নতুন ধারার মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণের নির্দেশনা দেয়া হয়। এ পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণয়নে শিক্ষাক্রম ২০১২ এর সাথে অনেকাংশে সামঞ্জস্য থাকলেও কতিপয় ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে, যা বর্তমানে কোন শিক্ষাক্রম প্রচলিত তা নিয়ে প্রশ্নের সৃষ্টি করে। সর্বোপরি, বর্তমানে যে বলবৎ কোনো শিক্ষাক্রম না থাকায়

একটি নতুন শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয়তা অনুমিত হয়। একইসাথে আগামী দিনের অনাগত শিক্ষাক্রমে যেন পূর্বের ন্যায় বিতর্কিত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্তি না ঘটে সেজন্য পাঠ্যপুস্তকের বিতর্কিত বিষয়াদি, মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং ধর্মশিক্ষার অবহেলার বিষয়াদির পর্যালোচনা প্রয়োজন। এ গবেষণার মাধ্যমে বিতর্কিত বিষয়াবলি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে, যা নতুন শিক্ষাক্রম ও নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে একটি গাইডলাইন হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো

বাংলাদেশের শিক্ষা প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক এই তিনটি প্রধান ধাপে বিভক্ত রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার পরিধি ৫ বছর, যা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন, মাধ্যমিক শিক্ষার পরিধি ৭ বছরকে তিনটি উপধাপে বিভক্ত যথা নিম্নমাধ্যমিক ৩ বছর, মাধ্যমিক ২বছর এবং উচ্চমাধ্যমিক ২ বছর। প্রাথমিকে প্রবেশের বয়স ৬ বছর, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকের বয়স যথাক্রমে ১১-১৩, ১৪-১৫ এবং ১৬-১৭ বছর। ডিগ্রি পর্যায়ের সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি, প্রকৌশলী, কৃষি, ব্যবসায় শিক্ষাকে উচ্চ মাধ্যমিক অনুসরণ করা হয় এবং মাস্টার্স পর্যায়ের চিকিৎসা শিক্ষা ৫-৬ বছর।

সাধারণ শিক্ষায় উচ্চ মাধ্যমিককে অনুসৃত কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা পাস/অনার্স ডিগ্রি কোর্স (৪ বছর) দিয়ে শুরু হয়। মাস্টার্স কোর্স ডিগ্রি অনার্স ডিগ্রি প্রাপ্তদের জন্য ০১ বছর এবং ডিগ্রি পাস শিক্ষার্থীদের জন্য ০২ বছর। এছাড়া কারিগরির আওতায় উচ্চ শিক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিকের পর থেকে শুরু হয়। প্রকৌশল, ব্যবসা, চিকিৎসা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি হল কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রধান ক্ষেত্র। চিকিৎসা শিক্ষা ছাড়া প্রতিটি কোর্স ৫ বছর।

শিক্ষানীতি ও শিক্ষাক্রম

শিক্ষানীতি হলো একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য নির্ধারিত দিকনির্দেশনা ও লক্ষ্যসমূহের সমষ্টি। এটি শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কাঠামো এবং শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে কীভাবে শিক্ষা প্রদান করা হবে, তা নির্ধারণ করে। শিক্ষানীতিতে সাধারণত শিক্ষার মান উন্নয়ন, সমতা, প্রবেশাধিকার এবং শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে কী ধরনের বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে, তা নির্ধারণ করা হয়। পক্ষান্তরে শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষানীতির আলোকে নির্দিষ্ট শিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থীদের কী শেখানো হবে, এর রূপকল্প। এতে পাঠ্যসূচি, পাঠ্যবই, শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। শিক্ষাক্রম শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যকরী রূপরেখা প্রদান করে।

শিক্ষানীতি ও শিক্ষাক্রম পরস্পর সম্পর্কিত হলেও শিক্ষানীতি শিক্ষার সামগ্রিক লক্ষ্য ও দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে, যেখানে শিক্ষাক্রম সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু ও শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্ধারণ করে। একইসাথে শিক্ষানীতি সাধারণত

নীতিগত ও দার্শনিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে, যেখানে শিক্ষাক্রম বিস্তারিত পাঠ্যসূচি, পাঠ্যবই এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করে। সর্বোপরি, শিক্ষানীতি একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য সামগ্রিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে, এবং সেই নীতির আলোকে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ ও ২০২১ (বিস্তরণ-২০২২)

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এ কমিশন ১৯৭৪ সালের ৩০ মে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালে অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়, যে কমিশন ১৯৮৮ সালে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ১৯৯৭ সালে অধ্যাপক এম. শামসুল হকের নের্তৃত্বাধীন কমিশন জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৯৭ প্রকাশ করে। সবশেষ ২০০৯ সালে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়, যে কমিটি জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০ প্রকাশ করে। বর্তমানে বলবৎ এ শিক্ষানীতির আলোকে সর্বপ্রথম জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ প্রণীত হয়। এই শিক্ষাক্রমে আবশ্যিক বিষয়সমূহ সাধারণ, মাদ্রাসা, ইংরেজি, কারিগরি শাখায় ৬ষ্ঠ-৮ম পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমে প্রযুক্তির ব্যবহারে গুরুত্বারোপ, পাঠ্যপুস্তকে প্রতিটি অধ্যায় শেষে শিখন ফল এবং শিখন ঘন্টা অনুযায়ী অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা এবং সৃজনশীল প্রদ্ধতিতে বহুনির্বাচনী ও সৃজনশীল এ দুই ধরনের প্রশ্ন প্রবর্তিত হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো : শিক্ষার্থীদেরকে সৃজনশীল করা অর্থাৎ বিশ্লেষণমূলক, চিন্তা উদ্দীপক ও সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর ও ব্যবহারিক কাজ অনুশীলনের মাধ্যমে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার বিকাশের সুযোগ প্রদান। সর্বোপরি, মুখস্থনির্ভর শিক্ষার বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' ঘোষণা করে প্রবর্তিত হয় 'সৃজনশীল পদ্ধতি'। সবশেষ ২০২১ সালে সরকার নতুন করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রণয়ন করে যা, ২০২২ সাল থেকে প্রয়োগ শুরু হয়, সেজন্য অনেকে একে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ও বলে থাকেন। মূলতঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ এবং বিস্তরণ ২০২২ এ দুটি পর্যায়ে এটি বিস্তৃত। শিক্ষাক্রম ২০২১ এর ভিশন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ রূপকল্প বাস্তবায়নের অভিলক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ-

- সকল শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশে কার্যকর ও নমনীয় শিক্ষাক্রম প্রণয়ন
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষার্থীর বিকাশ ও উৎকর্ষের সামাজিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা
- প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের বাইরেও বহুমাত্রিক শিখনের সুযোগ সৃষ্টি ও স্বীকৃতি প্রদান
- সংবেদনশীল, জবাবদিহিমূলক একীভূত ও অংশগ্রহণমূলক শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ
- শিক্ষা ব্যবস্থার সকল পর্যায়ে দায়িত্বশীল, স্ব-প্রণোদিত, দক্ষ ও পেশাদার জনশক্তি নিয়োগ।

এ শিক্ষাক্রমকে মুখস্থ বিদ্যার বিপরীতে অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষা হিসেবে অভিহিত করা হয়। (জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১, ১৬) অভিলক্ষ্যসমূহ অত্যন্ত শ্রুতিমধুর ও কার্যকর মনে হলেও এ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের শুরু থেকেই অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, গবেষক মহল থেকে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে। এ সকল সমালোচনার অন্যতম কয়েকটি হলো-

- পরীক্ষা না থাকা
- নবম-দশম শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিষয়ে নম্বর হ্রাস
- বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কমিয়ে দেয়া
- নবম শ্রেণিতে বিভাগ নির্বাচনের সুযোগ না থাকা
- বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের বাধ্যবাধকতা
- দলগত কাজের আধিক্য
- ধর্মশিক্ষায় পরীক্ষা না থাকা
- শিক্ষা দক্ষতাভিত্তিক করতে গিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষার সুযোগ কমে যাওয়া।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ এর পাঠ্যপুস্তক, মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে তীব্র প্রতিবাদের গণক্ষোভ থাকায় ২৪ বিপ্লবের পর শিক্ষাক্রম ২০২১ বাতিল হয়ে পুনরায় শিক্ষাক্রম ২০১২ গৃহীত হয়। এর প্রেক্ষিতে আমরা একটু দেখে নিতে পারি জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ ও জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এর মধ্যে বেশ কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। নিচে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হলো:

এক. মূল্যায়ন পদ্ধতি

শিক্ষাক্রম ২০১২ এ বার্ষিক পরীক্ষা এবং পাবলিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হতো। মূলত লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন হতো। কিন্তু শিক্ষাক্রম ২০২১ এ ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং শিখন-ফল মূল্যায়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষাক্রম ২০২১ এ শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ, প্রকল্পভিত্তিক কাজ, ব্যবহারিক দক্ষতা পরীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

দুই. বিষয় কাঠামো ও পাঠ্যক্রম

শিক্ষাক্রম ২০১২ এ বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাজন নবম শ্রেণি থেকে শুরু হতো। শিক্ষাক্রম ২০২১ এ দশম শ্রেণি পর্যন্ত অভিন্ন পাঠ্যক্রম থাকছে।

তিন. শিক্ষা কার্যক্রমের পদ্ধতি

শিক্ষাক্রম ২০১২ এ সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠদান করার নির্দেশনা রয়েছে। পক্ষান্তরে শিক্ষাক্রম ২০২১ এ অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক, সমস্যা সমাধানমূলক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

চার. একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে ইসলাম শিক্ষাকে অবহেলা

বাংলাদেশ স্বাধীনের পর দেশে গঠিত সাতটি শিক্ষা কমিশনের সর্বশেষটি হয়েছিলো

২০১০ সালে। জাতীয় শিক্ষানীতির ২০১০ এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে- ধর্ম, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য ২০১০ সালের শিক্ষানীতি অনুসারে প্রণীত জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে ইসলামী শিক্ষাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে কার্যকর এ শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞান এবং ব্যবসায় শাখা থেকে ইসলামী শিক্ষাকে পুরোপুরি বাদ এবং মানবিক শাখায় ইসলামী শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে। অথচ, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগ থেকে ২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত বিগত সকল পাঠ্যক্রমে ইসলাম শিক্ষা বিষয়টি একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষাসহ সকল শাখায় শিক্ষার্থীরা নৈর্বাচনিক ও ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অধ্যয়ন করতে পারতো। এটি দেশের শিক্ষার্থীদেরকে ইসলাম শিক্ষা বঞ্চিত করার কূটকৌশল। এর মাধ্যমে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের হাজার হাজার শিক্ষার্থী ইসলাম শিক্ষা বিষয়টি পড়তে পারতো না। উচ্চ মাধ্যমিকে ইসলাম শিক্ষা পড়ার সুযোগ না থাকায় ডিগ্রি পর্যায়ের কলেজগুলোতে বিএ পাস কোর্সে ইসলাম শিক্ষা নেয়া এবং অনার্সে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হওয়ার মতো শিক্ষার্থী কমে যাচ্ছে। এছাড়াও এ পাঠ্যক্রমে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে 'ইসলাম শিক্ষ শাখাা' নামে কাগুজে স্বতন্ত্র শাখার কথা বলে জাতিকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে। 'ইসলাম শিক্ষা শাখা' কোনো কলেজে নেই এবং খোলারও অনুমতি নেই। এমনকি উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি কলেজে এ বিষয়টি খোলার জন্য বহু চেষ্টা-তদবির করেও অনুমতি পাওয়া যায়না। সর্বোপরি, একদিকে প্রচলিত বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে ইসলাম শিক্ষাকে বাদ এবং মানবিকে গুচ্ছভুক্ত করে ইসলাম শিক্ষা বন্ধের নীলনকশা করা হয়েছে, অপরদিকে 'ইসলাম শিক্ষা' নামক আলাদা বিভাগ খোলার কথা বলে সকল প্রক্রিয়া বন্ধ রেখে জাতিকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে।

সুপারিশ

শিক্ষাক্রম ২০২১ বাতিল করা হলেও ইসলাম শিক্ষার অবহেলার দিকটি এখনো রয়ে গেছে। কারণ, শিক্ষাক্রম ২০১২ তে ইসলাম শিক্ষা বিষয়টি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে নেওয়ার সুযোগ নেই। তাই শিক্ষার সকল পর্যায় ও শাখায় ইসলাম শিক্ষা বিষয়টি বাধ্যতামূলক করে শিক্ষাক্রম সংস্কার করা প্রয়োজন। কেবল নামমাত্র শিক্ষাক্রম বাতিল বলার মাধ্যমেই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হয়নি; কারণ শিক্ষাক্রম ২০১২ ছিল একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের এজেন্ডার বাস্তবায়ন, যাতে নাস্তিকতার প্রসার ও জাতিকে মেরুদণ্ডহীন করার ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল।

ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে বিতর্কিত বিষয়াবলি

বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ এর অধীনে ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তসমূহে যে সকল বিতর্কিত বিষয়াদি বিদ্যমান ছিল, সেগুলো পর্যালোচনা করে সম্ভাব্য সমাধান তুলে ধরা হয়েছেঃ

ক. বইয়ের নাম : বিজ্ঞান অনুসন্ধানী পাঠ

উক্ত বইয়ের ১০২-১০৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ হয়েছে:

তবে এই আধুনিক মানুষের আগেও মানুষের কিছু আদি প্রজাতি ছিল যারা কিন্তু এভাবে সোজা হয়ে দুই পায়ে হাঁটতে পারত। বিবর্তন (evolution) বিষয়ে গবেষণা আমাদের সেটা বুঝতে সাহায্য করে। আফ্রিকা, এশিয়া এবং ইউরোপে পাওয়া ফসিল বা জীবাশ্মগুলোর বিস্ময়কর উপস্থিতি এবং ক্রম-বিস্তৃতি থেকে আমরা আমাদের বিবর্তনকে বুঝতে পারি। জীবাশ্ম রেকর্ড থেকে আমরা বুঝতে পারি, কখন আমরা সোজা হয়ে হাঁটতে শুরু করেছি। আকারগত পরিবর্তনগুলো যেমন আমাদের শরীরের চওড়া নিতম্ব (পশ্চাৎভাগ), পায়ের বাকি অংশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পায়ের বড় আঙুল এবং ছোট বাহু কখন পেয়েছি। বিবর্তনের ধারায় আমাদের মস্তিষ্কের আকারও বেড়েছে। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত গবেষণা তথ্য বলছে, প্রায় ২ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকা মহাদেশে মানুষের অস্তিত্ব ছিল। আমাদের চেনাজানা প্রাণীদের ভেতর বানর, ওরাং-ওটাং, শিম্পাঞ্জি এরা মানুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সবচেয়ে কাছাকাছি। মানুষসহ এসব প্রাণীদের বলা হয় প্রাইমেট

মন্তব্য: এখানে পুরো ব্যাপারটি যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে কিছু বিষয় রয়েছে যা আমাদের প্রচলিত মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। যেমন, এখানে বিবর্তনবাদকে[১] অকাট্যভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে- যা বাংলাদেশের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস তথা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক তো বটেই, খোদ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও বিতর্কিত। বিষয়টির সংবেদনশীলতা বিবেচনা করে উপরিউক্ত অংশটি এভাবে লেখা যেতে পারে :

বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখেছেন যে, সময়ের সঙ্গে প্রাণীদের শারীরিক গঠন ও জীবনযাত্রায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। আফ্রিকা, এশিয়া এবং ইউরোপে পাওয়া জীবাশ্ম বা ফসিল থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী,

---

১. বিবর্তনবাদ তত্ত্বের মৌলিক সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে:

- প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection): যে প্রাণীরা তাদের পরিবেশের সঙ্গে বেশি সঙ্গতি রাখে, তারা বেঁচে থাকে এবং তাদের বৈশিষ্ট্য পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত হয়।
- অভিযোজন (Adaptation): প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে, প্রাণীরা বা উদ্ভিদরা তাদের পরিবেশে টিকে থাকার জন্য বিশেষ কিছু পরিবর্তন বা অভিযোজন ঘটায়। এটি তাদের টিকে থাকার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।
- বৈচিত্র্য (Variation): প্রজাতির মধ্যে বৈচিত্র্য বা পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। এই বৈচিত্র্য কোনো জেনেটিক পরিবর্তন (mutation) বা পরিবেশগত প্রভাবে তৈরি হতে পারে। এই বৈচিত্র্যের কারণে, কিছু প্রাণী বা উদ্ভিদ অন্যদের থেকে আরও সফলভাবে পরিবেশে টিকে থাকতে পারে।
- সাধারণ পূর্বপুরুষ (Common Ancestry): সব জীবিত প্রাণী একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়েছে। এর মানে হলো, বর্তমানের সব জীবের মধ্যে কিছু সম্পর্ক রয়েছে এবং তারা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভক্ত হয়েছে। যেমন, মানুষের ডিএনএ (DNA) শিম্পাঞ্জির সঙ্গে ৯৮%-এর বেশি মিলে যায়, যা সাধারণ পূর্বপুরুষের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

মূলত এই 'Common Ancestry' তথা 'সাধারণ পূর্বপুরুষ' নিয়েই আপত্তির শুরু। মানুষের মর্যাদা ও সামাজিক মূল্যবোধ বহু পুরনো থেকেই একটি মৌলিক এবং অপরিবর্তনীয় বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সকল প্রাণীর 'সাধারণ পূর্বপুরুষ' তত্ত্ব স্বীকার করে নিলে মানুষের সৃষ্টিগত মর্যাদা হ্রাস পেয়ে এক ধরনের অপ্রয়োজনীয় নৈতিক ও দার্শনিক জটিলতার সৃষ্টি হয় যা মানুষের হাজার হাজার বছরের চাক্ষুস অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে। সেই সাথে মানব সভ্যতার সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের দীর্ঘ প্রক্রিয়াকে অবমূল্যায়ন করে এবং মানুষের আত্মপরিচয় ও শৃঙ্খলা নিয়ে অযৌক্তিক প্রশ্ন তোলে।

প্রাণীদের শরীরের বিভিন্ন অংশের গঠন পরিবর্তিত হয়েছে, যেমন, মেরুদণ্ডের সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা, পায়ের আঙুলের বিশেষ গঠন এবং মস্তিষ্কের আকারের বৃদ্ধি। এসব পরিবর্তন কবে থেকে ঘটেছে তা বিজ্ঞানীরা নির্ধারণ করার চেষ্টা করছেন। তারা আরও উল্লেখ করেছেন যে, প্রায় ২ লক্ষ বছর আগে মানুষ হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব ছিল। বানর, শিম্পাঞ্জি, এবং ওরাং-ওটাং-এর দেহের গঠন মানুষের সাথে কিছুটা সাদৃশ্যপূর্ণ, তবে এসব বিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখনও গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে আমাদের সম্যক জ্ঞান এখনও পরিপূর্ণ নয়, এবং ভবিষ্যতে নতুন গবেষণায় আরও অনেক কিছু জানা যেতে পারে।

একই বইয়ের ১০৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে:

সকল প্রাইমেট জাতীয় প্রাণীদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। আর তা হচ্ছে এদের শরীরের মেরুদণ্ডের উপস্থিতি। আমাদের পিঠের মাঝ বরাবর যে খণ্ড খণ্ড হাড়ের উপস্থিতি আমরা হাত দিলেই অনুভব করতে পারি এটিই আমাদের মেরুদণ্ড, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় spine

এখানে দেখা যায় যে, 'সকল প্রাইমেট জাতীয়' প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য বললে মানুষ, বানরসহ সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীকে নির্দেশ করে, যা প্রকারান্তরে বিবর্তনবাদকেই বোঝায়। এ অধ্যায়ে মানুষের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনার উপস্থিতি বেমানান। উপরিউক্ত বাক্যগুলোর বদলে নিম্নোক্ত বাক্যগুলো প্রতিস্থাপিত করা যেতে পারে:

মানব দেহের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো মেরুদণ্ডের উপস্থিতি। আমাদের পিঠের মাঝ বরাবর যে খণ্ড খণ্ড হাড়ের উপস্থিতি আমরা হাত দিলেই অনুভব করতে পারি এটিই আমাদের মেরুদণ্ড, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় spine।

উক্ত শব্দ ও বাক্য পরিবর্তনের ফলে অহেতুক বিতর্ক এড়ানো সম্ভব হবে। একই বইয়ের ১০৯-১১১ পৃষ্ঠায় বয়ঃসন্ধি, বয়ঃসন্ধিতে ছেলেদের শারীরিক পরিবর্তন, বয়ঃসন্ধিতে মেয়ের ক্ষেত্রে শারীরিক পরিবর্তন, নারী-পুরুষের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা রয়েছে।

এ বিষয়টি বাদ দিতে হবে। ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য এসব আলোচনা মানানসই নয়। দলগত আলোচনার নামে এ বিষয়গুলো নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা শিশুদের চরিত্রহীন করে তোলে। এছাড়া এসকল বিষয় প্রাকৃতিক ভাবেই মানুষ পরিবার ও সমাজ থেকেই শিক্ষা অর্জন করে থাকে।

খ. বইয়ের নাম : স্বাস্থ্য সুরক্ষা

- পৃ. ৪৭-৪৯: নারী ও পুরুষের শারীরিক গঠন, ঋতুস্রাব, বীর্যপাত ইত্যাদির আলোচনা। একই পাঠ্যবই ছাত্র-ছাত্রী সকলের জন্য।

মন্তব্য: এ বিষয়টি বাদ দেওয়া উচিত। ১১-১২ বছরের শিশুদের জন্য খুবই বেমানান। অথচ পূর্বে ছাত্রীদের জন্য আলাদা গার্হস্থ্য বই ছিলো, যা ছিলো শালীন ও মার্জিত। কিন্তু বর্তমান বইয়ে শালীনতা বর্জনের অপতৎপরতা লক্ষ্যণীয়।

- পৃ. ৫৬-৭১: চলো বন্ধু হই। পুরো অধ্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ মেলামেশার উৎসাহমূলক প্রশিক্ষণ রয়েছে। বিভিন্নক্ষেত্রে তাদের একত্রে বন্ধুমেলা উৎসবের নামে বেলেল্লাপনার তালিম দেয়া হয়েছে।

মন্তব্য: এ অধ্যায়টি বাদ দেয়া জরুরি। ইসলামী দৃষ্টিকোণের পাশাপাশি বাংলাদেশের সামাজিক মূল্যবোধ বিবেচনায়ও কিশোর-কিশোরীদের অবাধ মেলামেশা সমর্থিত নয়।

- পৃ. ৮৯-১১৯: অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা বলি। এ অধ্যায়ে নিজের প্রয়োজন ও অনুভূতি সহপাঠি বন্ধুর কাছে, বিশেষত নারী/পুরুষ বন্ধুর কাছে প্রকাশের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, যা ৮৯ পৃষ্ঠায় দেয়া ছবি থেকেই দৃশ্যমান। এছাড়াও এখানে পিতা-মাতার সাথেও দূরত্ব সৃষ্টির প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে পিতা-মাতার অবাধ্যতার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, পৃ. ১০২-১০৩, ১০৭; নিরাপদ ও অনিরাপদ স্পর্শ শেখানোর নামে নিজ আপত্তি না থাকলে স্পর্শ করার বৈধতা দেয়া হয়েছে। **মন্তব্য:** এ অধ্যায়টি বাদ দেয়া কর্তব্য। সর্বোপরি, এ বইটির পরিবর্তে পূর্বের কারিকুলামে থাকা শারীরিক শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, কৃষি শিক্ষা বইগুলো হতে পারে বিকল্প পাঠ্যপুস্তক।

গ. বইয়ের নাম : ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান

- 'নানা পরিচয়ে আমি' শীর্ষক অধ্যায় : এই শিরোনামে স্বতন্ত্র অধ্যায়ের প্রয়োজনীয়তা খুবই কম।

সুপারিশ : এই শিরোনামের পরিবর্তে আমাদের বাংলাদেশী জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর সামাজিক জীবন, সাংস্কৃতি, অর্থনীতি, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের শিরোনাম হতে পারে- 'বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী'। এ অধ্যায়ে কয়েকজন বিখ্যাত মনীষীর জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে আলাদা একটি অধ্যায় সংযোজন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বাংলাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে যে সকল সমাজ সংস্কারক বা রাজনীতিবিদের বিশেষ অবদান রয়েছে তাদের জীবনী সংযোজন করা যেতে পারে। যেমন সৈয়দ নেসার আলী তিতুমীর, মুনশী মেহেরুল্লাহ, নবাব সলিমুল্লাহ, একে ফজলুল হক, হাজী শরীয়ত উল্লাহ, হাজী মোহাম্মদ মহসীন, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ।

- 'সক্রিয় নাগরিক ক্লাব' শীর্ষক অধ্যায়: আলোচনার সাথে অধ্যায়ের মিল নেই।

সুপারিশ: এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ও শিরোনাম পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখতে হবে একজন শিক্ষার্থীর সামাজিকরণে যে সকল প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা রয়েছে বা জীবন চলার পথে যে সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত হবে সেসকল প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বিভিন্ন নিয়মাবলী ও সদাচরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংযোজন করা যেতে পারে।

- 'ইতিহাস জানার উপায়' শীর্ষক অধ্যায়: অধ্যায় হিসেবে এর প্রয়োজনীয়তা কম।

সুপারিশ : এই শিরোনামের বিষয়বস্তুর সাথে ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদানসমূহ সংযুক্ত

করা যেতে পারে। এ অধ্যায়ের আলোচনাগুলো 'বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসে ভূ-প্রকৃতির প্রভাব' শীর্ষক অধ্যায়ের সাথে দেয়া যেতে পারে। অযথা অধ্যায় বা শিরোনাম বৃদ্ধি করে কলেবর না বাড়ানোই শ্রেয়।

- 'প্রকৃতি সংরক্ষণ কার্যক্রম' শীর্ষক অধ্যায়: এই অধ্যায়ে শুধুমাত্র বন্যপ্রাণী নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

সুপারিশ : এক্ষেত্রে এই অধ্যায়ে প্রকৃতি ও পরিবেশ দূষিত হওয়ার মানবসৃষ্ট কারণসমূহ (যেগুলো আমরা প্রতিদিনই করে থাকি) নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায় থেকে কিভাবে এই দূষণ রোধে ভূমিকা নেয়া যায়– সে সম্পর্কিত আলোচনা সংযুক্ত করা যেতে পারে। এছাড়াও পরিবেশ দূষিত হওয়ার কারণে যেসকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা সমস্যার সৃষ্টি হয়- সেগুলোও যুক্ত করা যেতে পারে।

- 'আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক অধ্যায়: মুক্তিযুদ্ধের পরিপূর্ণ ইতিহাস বর্ণনা অপ্রতুল।

সুপারিশ : এই অধ্যায়ের নাম 'আমাদের মুক্তিযুদ্ধ' করা যেতে পারে। এই শিরোনামে- ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার উল্লেখযোগ্য ঘটনাপ্রবাহ উল্লেখ করা যেতে পারে। একইসাথে ২৪ এর নতুন প্রজন্মের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-গণআন্দোলনের তথ্যাবলি সংযুক্ত করা যেতে পারে। তাতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের আত্মত্যাগ এবং অবদানের তথ্যাবলি তুলে ধরা যেতে পারে।

- 'হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় বাংলা অঞ্চলে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়' শীর্ষক অধ্যায় : ইতিহাসের ক্রমধারা রক্ষিত হয়নি।

সুপারিশ : যদি 'বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসে ভূ-প্রকৃতির প্রভাব' শীর্ষক অধ্যায়ে বাংলার বিভিন্ন প্রাচীন জনপদ, সময়ের পরিক্রমায় বিভিন্ন বিদেশীদের শাসন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহলে নতুন এ অধ্যায়ের প্রয়োজন থাকে না। এভাবে হলে ইতিহাসের ক্রমধারা শিক্ষার্থীরা সহজেই অনুধাবন করতে পারবে।

- 'প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো' শীর্ষক অধ্যায় : সুস্পষ্ট বর্ণনা না রেখে ঢালাও বর্ণনা রাখা হয়েছে।

সুপারিশ : এই অধ্যায়টির প্রকৃতি অংশটুকু প্রকৃতি সংরক্ষণ কার্যক্রম অধ্যায়ে সংযুক্ত করে অধ্যায়টির নামকরণ করা যেতে পারে 'আমাদের প্রকৃতি ও এর সংরক্ষণের উপায়'। এরকম ঢালাও বর্ণনা না রেখে প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায়ন ও তথ্য সংযুক্ত করা যেতে পারে। যেমন- পাহাড়, পর্বত, নদী, সমুদ্র, পর্বতমালা, মরুভূমি, মালভূমি, মেরু অঞ্চল, তৃণভূমি ইত্যাদি। সমাজ কাঠামো অংশকে আরো বিস্তৃত করা যেতে পারে। সমাজের পরিচয়, সমাজের বিভিন্ন উপাদানসমূহের আলোচনা, পরিবার ও এর ভূমিকাসমূহ, সামাজিকীকরণ, সমাজ কাঠামো ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে অধ্যায়ের নাম হবে 'সামাজিক কাঠামো'।

- 'প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর অন্তঃসম্পর্ক' শীর্ষক অধ্যায় : এ অধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক যে আলোচনাগুলো হয়েছে তার গুরুত্ব তুলনামূলক কম।

সুপারিশ : এ অধ্যায়ের আলোচনাগুলো প্রস্তাবিত 'সামাজিক কাঠামো' অধ্যায়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

- পৃ. ১১, ১২, ১৪, ২৪, ৩৩-৩৪, ৭৪-৭৮, ১১৯, ১২১, ১৩৭-১৪৮: অযাচিতভাবে বাদ্যযন্ত্র, কার্টুন ও ভাস্কর্য সংযোজন করা হয়েছে। যেগুলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।

মন্তব্য: একই বই স্কুল মাদ্রাসার জন্য প্রণীত অথচ এমন ছবি, বাদ্যযন্ত্র, কার্টুন, ভাস্কর্য সংযোজন করা হয়েছে, যেগুলো স্কুল মাদ্রাসার কোনো শিক্ষার্থীর জন্যই উপকারী নয়।

- পৃ. ৩৪: অপ্রাসঙ্গিকভাবে খ্রিষ্টাব্দ, তথা কবে থেকে এ তারিখ গণনা শুরু হয় তা আলোচনা করা হয়েছে। যদি তা থাকতেই হয়, তাহলে হযরত উমর (রা.) থেকে হিজরী এবং বাদশাহ আকবর কর্তৃক বাংলা সন গণনার তথ্যও সংযুক্ত করে আলাদা অধ্যায় যুক্ত করা যায়।

সুপারিশ : ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইটিতে অনেকগুলো অযাচিত অধ্যায়ের অবতারণা যেমন করা হয়েছে, তেমনি ইতিহাসের আলোচনাতে অনেক ক্ষেত্রে ক্রমধারা রক্ষিত হয়নি। সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়াদি গল্পের আড়ালে অনেক ক্ষেত্রে পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। অধ্যায় বিন্যাস, তথ্য সংযোজনপূর্বক পুরো বইটি নতুন করে সাজানো প্রয়োজন।

গ. বইয়ের নাম : শিল্প ও সংস্কৃতি

মন্তব্য: এ বইটির শুরুতেই বইটির মূল উদ্দেশ্য-প্রকাশক একটি প্রচ্ছদ রয়েছে। হাস্যকর হলেও সত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি এ বইয়ে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন সংস্কৃতির বর্ণনা থাকলেও ইসলাম ধর্মের সংস্কৃতিগুলোকে সচেতনভাবে বাদ দেয়া হয়েছিল। এ বইটি সম্পূর্ণভাবে সিলেবাস থেকে বাদ দেয়া উচিত। ইসলামে হারাম হওয়া স্বত্ত্বেও বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য, বিভিন্ন প্রাণির ছবি আঁকা, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, অভিনয় ইত্যাকার অশ্লীলতা শেখানোর আয়োজন করা হয়েছে স্কুল-মাদ্রাসার শ্রেণিকক্ষে।

ঘ. বইয়ের নাম : জীবন ও জীবিকা

মন্তব্য: ভাত রান্না, ডিম ভাজা, আলু ভর্তা করা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ বইটি সিলেবাসে থাকার প্রয়োজন নেই। শহরের ১৫-২০ শতাংশ শিক্ষার্থীদের কারণে সবার উপর এমন একটি বিষয় চাপিয়ে দেওয়া অনুচিত। আমাদের দেশের মায়েরা সাধারণত তাদের সন্তানদেরকে পারিবারিকভাবেই রান্নাবান্না শিখিয়ে থাকেন। এগুলোকে সবার জন্যে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা কোন যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নয়।

সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে বিতর্কিত বিষয়াবলি

বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ এর অধীনে সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তসমূহে যে সকল বিতর্কিত বিষয়াদি বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলো পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত সুপারিশসহ উপস্থাপন করা হলো :

ক. বইয়ের নাম : বাংলা

- পৃ. ২০-২৫: 'কত দিকে কত কারিগর' শিরোনামের প্রবন্ধটিতে কুমোরদের ভাস্কর্য তৈরির গল্প তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রবন্ধটিতে কয়েকটি স্থানে মূর্তি, মুকুট যেমন রয়েছে, তেমনি মুসলমানদের অন্যতম নিদর্শন দাড়ি নিয়ে হাসি তামাশা করা এবং রবীন্দ্রনাথের দাড়ির সাথে লালন ফকির, মওলানা ভাসানীর দাড়ির সাথে তামাশামূলক আলোচনার অযাচিত অবতারণা করা হয়েছে।

মন্তব্য ও সুপারিশ: ইসলামের প্রতীকি নিদর্শনকে ব্যঙ্গ করা বিষয়াবলি মুসলমানদের পাঠ্যপুস্তক থেকে অবশ্যই বাদ দিতে হবে এবং এ ধররে জঘন্য কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে হবে।

খ. বইয়ের নাম : ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান

- পৃ. ৩২: সালাম: আমি 'যেমন খুশি তেমন সাজো'তে বেগম রোকেয়া সাজব। সালাম: আমি 'যেমন খুশি তেমন সাজো'তে পাহাড়ী মেয়ে সাজব।

মন্তব্য: ছেলেকে দিয়ে মেয়ে সাজানোর বিষয়টি অগ্রহণযোগ্য, যা ইসলামে নিষিদ্ধ। এ অংশটি বাদ দিতে হবে।

- পৃ. ৩২: শিহান: আমি সাজব 'বঙ্গবন্ধু'। ..... শিখে নেবো।

সুপারিশ: চিহ্নিত বাক্যগুলোর স্থলে প্রতিস্থাপিত করা যেতে পারে নিম্নোক্ত বাক্যগুলো-

শিহান: আমি সাজব 'কুমোর'। আমার মায়ের মাটির হাঁড়ি নিবো। বাবার ব্যবহৃত লুঙ্গি আর গেঞ্জি চেয়ে নিবো। কাদা মাটি দিয়ে মাটির আসবাবপত্র তৈরির অভিনয় করবো।

মন্তব্য: মানুষে মানুষে সাদৃশ্য ও ভিন্নতা বুঝাতে কুমোর চরিত্রটি বৈচিত্র্যময় হবে।

- পৃ. ৩৯-৪২: নতুন পরিচয় ... নিজেদের ভাবনা সম্পর্কে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করি।

মন্তব্য ও সুপারিশ: এ অংশগুলো বাদ দিতে হবে। হিজড়াদের প্রতি মানবিক আচরণ সম্পর্কিত কোনো গল্প দেয়া যেতে পারে। এখানে শরীফ-শরিফার গল্পের মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডারিজমকে প্রমোট করা করা হয়েছে।

- পৃ. ৪৪: একজন মানুষকে বাইরে থেকে দেখেই কি সব সময় সে ছেলে না মেয়ে তা বোঝা যায়? ... তাহলে শরীফা আপারা কার কী ক্ষতি করেছেন?

মন্তব্য: চিহ্নিত অংশগুলো বাদ দিতে হবে। ট্রান্সজেন্ডারিজমকে প্রমোট করার উদ্দেশ্যে এটা সংযুক্ত করা হয়েছে।

- পৃ. ৬৯: তাঁর হাত ধরেই বাংলা অঞ্চলে তুর্কী-আফগান ও পারস্যদের শাসন

শুরু হয়। ... বোঝা যায়, ততোদিনে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে বলেই এই ভূ-খণ্ডের রাজা-কে 'বাঙ্গালা' কিংবা 'বাঙ্গালিয়ান' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে জেনে রাখবে, বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ শাসনকারী ফকরুদ্দিন মোবারক শাহ ... কেউ বাঙলা ভাষাভাষী ছিলেন না। কিন্তু এঁদের অনেকেই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে ভূমিকা রেখেছেন।

সুপারিশ: চিহ্নিত বাক্যগুলোর স্থলে বাক্যগুলো প্রতিস্থাপিত করা যেতে পারে-

তাঁর হাত ধরেই বাংলায় মুসলিম শাসন শুরু হয়। ... এভাবে তিনিই প্রথম বাঙ্গালা শব্দটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেছিলেন। এছাড়াও ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে সুলতানি শাসকদের অবদান অপরিসীম।

- পৃ. ৬৯: বাংলা অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তুর্কী, আফগান, পারসিয়ান, তাজিক, মোগল অভিজাতরা শাসন শুরু করেন। উত্তর ভারতের অংশ হিসেবে পূর্ব ভারতে অবস্থিত বাংলা শাসিত হতে থাকে।

মন্তব্য ও সুপারিশ: এখানে মুসলিম শাসনকে বহিরাগত, গণবিরোধী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করা হয়েছে। এটা সংশোধন করে নিম্নোক্ত বাক্যগুলো প্রতিস্থাপিত করা যেতে পারে-

১২০৪ থেকে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার পশ্চিমে নদীয়া ও উত্তর বাংলার কিছুটা অংশ বখতিয়ার খলজির দখলে ছিল। তারপর ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলা জুড়ে মুসলিম শাসনের বিস্তার ঘটে থাকে।

- পৃ. ৭০: বাংলা অঞ্চলে ইংরেজদের আগমন এবং শোষণের ইতিহাস অতীতে শোষণের ইতিহাস থেকে খুব একটা পৃথক নয়। মূলত অর্থ এবং ক্ষমতার জন্যই তার বাংলা অঞ্চলে আধিপত্য ... প্রতিরোধ আন্দোলন।

সুপারিশ: চিহ্নিত বাক্যগুলোর স্থলে নিম্নোক্ত বাক্যগুলো প্রতিস্থাপিত করা যেতে পারে :

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমণ করলেও ক্ষমতা দখল ও আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক শোষণ শুরু করলে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ এবং প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন।

- পৃ. ৭০: ২০ শতকে শুরুতেই হয়েছিল স্বদেশি আন্দোলন। ... স্বদেশি আন্দোলন চলাকালীন সময়েই ১৯০৫ সালে প্রথমবার বাঙলা ভাগ করা হয় (ইতিহাসে এই ঘটনা 'বঙ্গভঙ্গ' নামে পরিচিত)। পরববর্তীতে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয় এবং ১৯৪৭ সালে বাঙলাকে দ্বিতীয়বারের মতো বিভক্ত করা হয়। ..... বিপ্লবী নারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

সুপারিশ: চিহ্নিত বাক্যগুলো নিম্নোক্তভাবে লেখা যেতে পারে:

২০ শতকের শুরুতে ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে গোটা বাংলায় নানা আন্দোলন শুরু হয়। এর মধ্যে রয়েছে- স্বদেশী আন্দোলন, বয়কট আন্দোলন, স্বরাজ এবং সশস্ত্র আন্দোলন। এসব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ দেশের অধিকাংশ

মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম জেগে উঠে এবং তারা ঐক্যবদ্ধ হয়। শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে ওঠে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন। এদের মধ্যে রয়েছেন ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, মাষ্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রমুখ বিপ্লবীরা। এসময় বাংলাসহ ভারতব্যাপী জাতীয় পর্যায়ে চলেছিল নানাবিধ নিয়মতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অসহযোগ আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, ভারত ছাড় আন্দোলন ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে, অন্যান্য কারণ থাকলেও নানা ধরনের ধারাবাহিক এসব আন্দোলন ও সংগ্রামের চাপেই ব্রিটিশরা এদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল।

- পৃ. ৭১-৭৪: বাংলা ভাগ ও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতার পথে বাংলাদেশ ... বঙ্গবন্ধুর 'বিশ্ববন্ধু' উপাধি প্রাপ্তি।

সুপারিশ: চিহ্নিত অংশগুলো বাদ দেওয়া যেতে পারে। বাংলা ভাগ ও স্বাধীনতার পথে বাংলাদেশ (এ শিরোনামে নতুনভাবে লিখতে হবে।)

- পৃ. ১২৭-১২৯: সামাজিক প্রেক্ষাপটের বদল হলে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা বদলায়। (শীর্ষক অনুচ্ছেদ)

মন্তব্য: চিহ্নিত অনুচ্ছেদটি বাদ দিতে হবে। এখানে এমন একটি গল্প দেয়া হয়েছে, যাতে মেয়েদের পর্দা ও শালীনতার বাধা দূর হলে তারা অনায়াসেই বিশ্বসেরা হতে পারবে। অর্থাৎ এখানে পর্দাকে প্রগতির অন্তরায় প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। এ অধ্যায়টি নতুনভাবে লিখতে হবে।

- পৃ. ১০৯, ১২৭: একই বই স্কুল ও মাদ্রাসার জন্য প্রণিত অথচ এমন ছবি সংযোজন করা হয়েছে যা অধিকাংশ স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধের পরিপন্থী।

মন্তব্য ও সুপারিশ: সমগ্র বইয়ে ফ্রান্সিস নামে একটি চরিত্রের রূপায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের কোনো মানুষের এরকম নাম বড়ই বেমানান। সমগ্র বইয়ে শিক্ষক চরিত্রে 'খুশি আপা' রয়েছে। আগে আপা বলা হলেও বর্তমানে আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষিকাকে ম্যাম, ম্যাডাম বলা হয়।

- 'যৌক্তিক সিদ্ধান্ত কিভাবে নেওয়া' শীর্ষক অধ্যায় : অনুসন্ধানমূলক কার্যক্রম এবং যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আলোচনা কার্যকরি হলেও এক্ষেত্রে উদ্ধৃত গল্পগুলো অপ্রাসঙ্গিক। দলের অন্যান্য সদস্যের মূল্যায়ন অংশ খুব বেশি কার্যকর নয়।

সুপারিশ: এ অধ্যায়ে সতীর্থ মূলায়ন অংশটি বাদ দেয়া যেতে পারে। বিভিন্ন তথ্য যাচাইয়ের ছকগুলোর পরিবর্তে বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন বা সমস্যা সমাধানের জন্য দেয়া যেতে পারে।

- 'অর্থনৈতিক ইতিহাস জানার উপায়' শীর্ষক অধ্যায় : খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতি, কৃষির সূচনা ও কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি, বাণিজ্য ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য অসম্পূর্ণ।

সুপারিশ: অর্থনৈতিক ইতিহাস জানার জন্য পরিপূর্ণ তথ্য সংযোজন করা। কেননা, এ বইয়ে অধিক গল্পের অবতারণা করতে গিয়ে মূল বিষয় উপেক্ষিত হয়েছে।

- 'মানুষে মানুষে সাদৃশ্য ও ভিন্নতা' শীর্ষক অধ্যায় : এই অধ্যায়ের অধিকাংশ আলোচনারই যৌক্তিকতা বা অধ্যায়ের সাথে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

সুপারিশ : এ অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া যেতে পারে 'বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্পদায়ের পরিচয়'। দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনাচার সংযুক্ত করা যেতে পারে।

- 'বাংলা অঞ্চল ও স্বাধীন বাংলাদেশের অথনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে' শীর্ষক অধ্যায়: এখানে ইতিহাসের ক্রমধারা রক্ষিত হয়নি।

সুপারিশ: এটিকে আলাদা অধ্যায় না করে এ অধ্যায়ের আলোচনাগুলো 'অর্থনৈতিক ইতিহাস জানায় উপায়' অধ্যায়ের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে। একই সাথে অর্থনৈতিক ইতিহাস এবং বাংলা অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং পরিশেষে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

- 'হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় বাংলা অঞ্চলে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' ও 'মুক্তিযুদ্ধের বিদেশি বন্ধুরা' শীর্ষক দুটি অধ্যায় : দুটি আলাদা অধ্যায়ের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট নয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে সংশ্লিষ্ট আলোচনাও অসম্পূর্ণ বলেই প্রতিয়মান।

পরামর্শ: দুটি অধ্যায়কে একত্র করে 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস' শিরোনামে একটি অধ্যায় করা যেতে পারে। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্বের ঘটনা প্রবাহ, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন দেশের সাধারণ জনগণের ত্যাগ ও অসীম বীরত্ব তুলে ধরা। একইসাথে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিভিন্ন বিদেশী সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও সাংস্কৃতিক কর্মী যেসকল অবদান রেখেছেন তা তুলে ধরা প্রয়োজন।

- 'সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো ও রীতিনীতি' শীর্ষক অধ্যায় : গল্পের তালে অনেক ক্ষেত্রে মূল আলোচনা হারিয়ে যায়। এটি ইতিহাসের সাথে সাহিত্যের মেলবন্ধনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

সুপারিশ: এ অধ্যায়ে সামাজিক কাঠামোর উপাদানসমূহ, বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি, সামাজিক মূলবোধ, সামাজিক ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রভাব, অপরাধ, রাজনৈতিক কাঠামো, বাংলাদেশের রাজনৈতিক কাঠামো ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

- 'প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা' শীর্ষক অধ্যায় : এই অধ্যায়ের যৌক্তিকতা খুবই কম বলেই প্রতীয়মান হয়।

সুপারিশ: এ অধ্যায়টি বাদ দেয়া যেতে পারে।

গ. বইয়ের নাম : শিল্প ও সংস্কৃতি

মন্তব্য: আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, 'শিল্প ও সংস্কৃতি'– নামক এ বইয়ে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন সংস্কৃতির বর্ণনা থাকলেও বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অনুসৃত ইসলাম ধর্মের সংস্কৃতিগুলোকে বাদ দেয়া হয়েছিল। বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য, বিভিন্ন প্রাণির ছবি আঁকা, চিত্রকলা, যাত্রাপালা, চৈত্রসংক্রান্তি, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, অভিনয় ইত্যাদি শেখানোর আয়োজন করা হয়েছিলো স্কুল মাদ্রাসার শ্রেণিকক্ষে।

বিষয়টি অত্যন্ত হতাশার ছিলো যে, মাদ্রাসাও এসব বিষয়কে সংস্কৃতির নামে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিলো। এটি আসলে ইসলামী শিক্ষা এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি সরাসরি অশ্রদ্ধা প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঘ. বইয়ের নাম : স্বাস্থ্য সুরক্ষা

মন্তব্য: নাস্তিকতা, ইসলামী ও বাঙালি সংস্কৃতি বিরোধী, বিজাতীয় সংস্কৃতির লালন, পর্দাকে নেতিবাচক হিসেবে উপস্থাপন, নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে এ বইয়ে।

সর্বোপরি, এ বইটির পরিবর্তে পূর্বের কারিকুলামে থাকা শারীরিক শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, কৃষি শিক্ষা বইগুলো হতে পারে বিকল্প।

ঙ. বইয়ের নাম : জীবন ও জীবিকা

মন্তব্য: ঘর গোছানো, বিছানা পরিষ্কার করা, থাল-বাটি ধোয়া, কাপড় ধোয়া, হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি। অগুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়কে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমাদের মায়েরা সাধারণত তাদের সন্তানদেরকে বইটিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলি পরিবার থেকেই শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা অযৌক্তিক। অন্য দেশের কালচার ও সিলেবাস দেখে নিজের দেশে সেটা বাস্তবায়নের চিন্তা সঠিক নয়। কারণ দেশভেদে সভ্যতা, সংস্কৃতি, কালচার ভিন্ন হয়ে থাকে।

অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে সমস্যাজনক বিষয়াবলি

ক. বইয়ের নাম : ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান

- পৃ. ১৭-২০: পরিচয়: বাঙালি মনীষী

সুপারিশ: এ শিরোনাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশের মনীষী করতে হবে। অমর্ত্য সেনের জীবনালেখ্যের পরিবর্তে বাংলাদেশের বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম কিংবা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুস-এর জীবনালেখ্য অন্তর্ভুক্ত করা।

- পৃ. ২১-২২: পরিচয়: বাঙালি মনীষী

মন্তব্য: এ শিরোনামে কোনো মুসলিম বাঙালি মনীষীর নাম অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি। এক্ষেত্রে সৈয়দ নেসার আলী তিতুমীর, হাজী শরিয়তুল্লাহ, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অথবা সৈয়দ আলী আশরাফ এর আলোচনা অর্ন্তভুক্ত করা যেতে পারে

খ. বইয়ের নাম : শিল্প ও সংস্কৃতি

এই বইতেও সপ্তম শ্রেণির ন্যায় ইসলাম ধর্মের সংস্কৃতিগুলোকে সচেতনভাবে বাদ দেয়া হয়েছিলো। বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য, বিভিন্ন প্রাণির ছবি আঁকা, চিত্রকলা, যাত্রাপালা, চৈত্রসংক্রান্তি, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, অভিনয়সহ অন্যান্য সকল বিষয় থাকলেও মুসলিম সংস্কৃতির কোনো বিষয়ের স্থান এতে হয়নি।

গ. বইয়ের নাম : স্বাস্থ্য সুরক্ষা

মন্তব্য: নাস্তিকতা, ইসলামী ও বাঙালি সংস্কৃতি বিরোধী, বিজাতীয় সংস্কৃতির লালন রয়েছে এ বইয়ের বিভিন্ন পাঠে। নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে এ বইয়ে। পঙ্কজ ও রাহেলা একসাথে পিকনিকে যাওয়ার গল্প (পৃ. ১০২)।
এ বইটির পরিবর্তে ২০১২ সালে কারিকুলামে থাকা শারীরিক শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, কৃষি শিক্ষা বইগুলো হতে পারে বিকল্প।

নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে বিতর্কিত বিষয়াবলি

নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকসমূহে যে সকল বিতর্কিত বিষয়াদি বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

ক. বইয়ের নাম : ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান

- পৃ. ১০০-১০৩: দিল্লির সুলতান এবং মোগল শাসকগণ বাংলার জল-জঙ্গলে নিয়মিত নিষ্কর জমি দান করতেন। তাঁদের ভূমি সম্প্রসারণ নীতি বাংলা অঞ্চলে ইসলাম বিস্তারে ভূমিকা রেখেছিল বলে ... ভূমিকা পালন করেছে। ... তোমরা পরবর্তীতে বাংলা অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস আরও বিস্তৃত পরিসরে পাঠ করার সুযোগ পাবে, তখন উৎসের গভীরতা অনুসন্ধানের মাধ্যমে অনেক সত্য উদ্ঘাটন করতে পারবে। ... খেয়াল করে দেখবে, বাংলা অঞ্চলের বৃহৎ একটি অংশে যেসব শাসনকর্তা শাসন করেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন আরব ও পারস্যের ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুসারী অভিজাত মুসলমান।

মন্তব্য: পাঠ্যপুস্তকে এ ধরনের বাক্যালাপ বাংলায় ইসলামের প্রসার ও মুসলিম শাসকদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টির প্রয়াস হিসেবেই প্রতিপন্ন হয়। এ দেশের ইসলামের আগমণের সাথে সাধারণ স্থানীয়দের সম্পর্ক নেই- সুকৌশলে এমন ধারণার প্রচার করা হয়েছে।

- পৃ. ১০৪: কথিত আছে যে, শায়েস্তা খানের সময়ে বাংলায় এক টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। এই ধরনের সাধারণীকরণ তথ্য সম্পর্কে আরো সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। নানান উৎসকে সমালোচনামূলক অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তবেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

সুপারিশ : চিহ্নিত অংশগুলো বাদ দেওয়া যেতে পারে। অনেকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবে একটি বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে এখানে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো বাংলার মুসলিম শাসকদের অবদানকে প্রশ্নবিদ্ধ করা।

- পৃ. ১০৪; ১০৮: বাইরের বণিকদের পাশাপাশি বাংলার অভ্যন্তরেও নবাবি শাসনের আসন দখল নিয়ে অভিজাতদের মধ্যে বিবাদ চলছিল।... বিদ্রোহের দায়ে অসংখ্য সিপাহিকে ইংরেজ সরকার ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করে।

সুপারিশ: চিহ্নিত বাক্যটির স্থলে নিম্নোক্ত বাক্যটি প্রতিস্থাপিত করা যেতে পারে।

বণিকদের সাথে নবাবদের দ্বন্দ্ব, শেঠজীদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং মিরজাফরসহ নবাবের আত্মীয়দের মাঝে ক্ষমতার লড়াই চলছিল। ... বিদ্রোহের দায়ে ইংরেজ বাহিনী বহু নিরপরাধ নারী, শিশুদের হত্যা করে এবং বিদ্রোহের দায়ে অসংখ্য সিপাহী এবং আলেমকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে।

উপরিউক্ত বাকভঙ্গিমার মাধ্যমে ইতিহাসের প্রকৃত সত্যচিত্র ফুটে ওঠে।

অন্যান্য সমস্যাবলি

বিভিন্ন শ্রেণির বাংলা সাহিত্য বইয়ে থাকা মহানবী ﷺ, সাহাবী ও বিভিন্ন মনীষীদের জীবনী বাদ দেয়া হয়েছে। যেমন, দ্বিতীয় শ্রেণি হতে 'সবাই মিলে করি কাজ' শিরোনামে মহানবী ﷺ এর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত্র, তৃতীয় শ্রেণি হতে খলিফা হযরত আবু বকর রা. এর জীবনী, ও চতুর্থ শ্রেণী হতে খলিফা হযরত ওমর রা. এর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত, ৫ম শ্রেণীর বই থেকে 'বিদায় হজ্জ' শিরোনামে মহানবী ﷺ এর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত, ৭ম শ্রেণী থেকে 'মরু ভাস্কর' শিরোনামে মহানবী ﷺ এর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত এবং ৯ম-১০ম শ্রেণী থেকে কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত 'ওমর ফারুক' কবিতা বাদ দেয়া হয়েছে।

পরামর্শ : প্রতিটি শ্রেণির বাংলা সাহিত্য বইয়ে মুসলিম মনীষীদের জীবনী একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে মুসলিম মনীষীদের জীবনচরিত থেকে শিক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদেরকে আদর্শ মানুষে পরিণত করার শিক্ষা লাভ করতে পারে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি

মূল্যায়ন পদ্ধতির কার্যকরিতার উপর শিক্ষাক্রম ও শিক্ষানীতির কার্যকারিতা নির্ভরশীল। তাই মূল্যায়ন শিক্ষাক্রমের একটি অপরিহার্য ও অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে বিবেচিত। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে প্রণীত শিক্ষাক্রম ২০১২ এ শিক্ষার্থীদের মুখস্থ প্রবণতা দূর করার লক্ষ্য নিয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ এ মূল্যায়নকে কেবল শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে পুরো শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন, শিখন পরিবেশের মূল্যায়ন ও সেই সঙ্গে শিখনের মূল্যায়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এ শিক্ষাক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ছিলো প্রচলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে মুখস্থবিদ্যাভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি থেকে সরে এসে বহুমাত্রিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন মাত্রার জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনা বিকাশের ধারাকে মূল্যায়নের আওতায় আনা।

সৃজনশীল পদ্ধতি মুখস্থ নির্ভর বিদ্যার পরিবর্তে চিন্তা ও প্রয়োগ দক্ষতার মাধ্যমে মুখস্থ বিদ্যার সাথে উদ্দীপক তথা ঘটনাপ্রবাহের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে উত্তর দেওয়ার সক্ষমতার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত। কার্যত পূর্বের মুখস্থ নির্ভর মূল্যায়ন পদ্ধতিতে থাকা গাইড-বইয়ের ন্যায় সৃজনশীল পদ্ধতির গাইড বই প্রকাশিত হতে থাকে; অধিক নম্বর প্রাপ্তির নেশায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরাও নির্ভর হয়ে পড়ে গাইড বইয়ের উপর। ফলশ্রুতিতে মুখস্থ নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা থেকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা মুক্তি লাভ করেনি (Sharif 2015, 21-30)।

২০২১ সালের শিক্ষাক্রমে সৃজনশীল পদ্ধতি বাতিল করে পরীক্ষা পদ্ধতির স্থলে মূল্যায়ন উৎসব চালু করা হলে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মাঝে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক সংবাদ প্রচারিত হয়, যেমন- দৈনিক প্রথম আলো সংবাদ প্রচার করে 'নতুন শিক্ষাক্রমে পরীক্ষা নয়, মূল্যায়ন হচ্ছে 'উৎসব' করে' শিরোনামে (Ahmed 2023)। সর্বোপরি, ২০২১ সালের শিক্ষাক্রমে বার্ষিক পরীক্ষার স্থলে সামষ্টিক মূল্যায়ন, মূল্যায়ন উৎসব, ধারাবাহিক মূল্যায়নের নামে প্রকারান্তরে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যবইয়ের প্রতি অনাগ্রহী করে তোলা হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা অর্ধ-বার্ষিকী ও বার্ষিক পরীক্ষা না থাকায় পাঠ্য বিষয়ের উপর প্রস্তুতি নিতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। একই সাথে মূল্যায়ন উৎসবের নামে এনসিটি কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রশ্নপত্রে মূল পাঠের সাথে সামঞ্জস্য না থাকার বিষয়টিও শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগিতা হারাতে উৎসাহ দিয়েছে। বিভিন্নমুখী সমালোচনার মুখে ২০২১ সালের শিক্ষাক্রমের অধীনে পরিচালিত মূল্যায়ন পদ্ধতি বাতিল করে পরীক্ষা পদ্ধতির পুনঃবহাল করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রচারিত পরিপত্রে বলা হয়, বিভিন্ন অংশীজনের অভিমত, গবেষণা ও জরিপে জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২২ এর পাঠ্য বিষয়বস্তু ও মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে অস্পষ্টতা ও নৈতিবাচক ধারণা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার প্রকট অভাব থাকায় বিদ্যমান মূল্যায়ন পদ্ধতি বাতিল করে জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ অনুসারে পাঠদান ও মূল্যায়ন পরিচালিত হবে।

উপরোক্ত পরিপত্র অনুসারে জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১২ অনুসারে মূল্যায়ন তথা সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশ্নপত্রের আলোকে বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশনা থাকলেও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড '২০২৪ সালের শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশনা' শিরোনামে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এ বিজ্ঞপ্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন ও বার্ষিক পরীক্ষা দুটিভাগে মূল্যায়ন থাকার নির্দেশনা দেয়। ফলশ্রুতিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১২ এর বার্ষিক পরীক্ষা এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ এর ধারাবাহিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে একটি নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতির সূচনা হয়। এখানে ধারাবাহিক মূল্যায়ন থেকে ৩০% নম্বর

এবং বার্ষিক পরীক্ষার ১০০ নম্বরকে ৭০ নম্বরে রূপান্তর করে সমন্বিত ফলাফল প্রস্তুতের নির্দেশনা দেয়া হয়। একইসাথে বার্ষিক পরীক্ষায় জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১২ এর আদলে নৈর্বক্তিক প্রশ্ন, এক কথায় উত্তর (জ্ঞান ও অনুধাবন স্তর), রচনামূলক প্রশ্ন দ্বারা মূল্যায়ন করারও নির্দেশনা দেয়া হয়। তবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর হুবহু অনুসরণ করে সৃজনশীল প্রশ্ন (৩০টি নৈর্বক্তিক+৭০ নম্বরের সৃজনশীল প্রশ্ন) না হলেও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে সৃজনশীল পদ্ধতির দক্ষতা মূল্যায়নের চারটি স্তর জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উত্তর দক্ষতা মূল্যায়নে সহায়ক দৃশ্যপট নির্ভর ও দৃশ্যপট বিহীন প্রশ্ন দ্বারা মূল্যায়নের নির্দেশনা দেয়া হয়। সর্বোপরি, বর্তমানে সৃজনশীল পদ্ধতি ও জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ এর ধারাবাহিক মূল্যায়নে সমন্বয়ে এক ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। অধিকন্তু পাঠ্যপুস্তকে সীমিত সংস্কার করে ২০১২ সালের পাঠ্যপুস্তক পুনঃমুদ্রণ করে সরবরাহ করা হয়েছে।

মন্তব্য

বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতিতে একদিকে যেমন সৃজনশীল প্রশ্ন দ্বারা মূল্যায়ন অন্যদিকে ধারাবাহিক মূল্যায়নেরও অন্তর্ভুক্তি থাকায় এটি একটি কার্যকর মূল্যায়ন পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত বলে মনে করছি। তবে শিক্ষাক্রম একটি দেশের শিক্ষার উন্নতির মাপকাঠি ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রার পরিচায়ক, সে বিবেচনায় মূল্যায়ন পদ্ধতি দুটি শিক্ষাক্রমের খণ্ডিত অনুসরণে দীর্ঘদিন চলতে পারে না।

পরামর্শ

তাই এ বিষয়ে পর্যাপ্ত গবেষণাকরে একটি শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুমিত হয়। নতুন শিক্ষাক্রমে মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে মুখস্থ বিদ্যাকে শিক্ষাঅর্জনে প্রতিবন্ধক মনে করে পরীক্ষা পদ্ধতির বাতিল করে মূল্যায়ন উৎসব যেমন গ্রহণযোগ্য নয়; তেমনি কেবল লিখিত পরীক্ষাকেই মূল্যায়নের মাধ্যম মনে করাও যুক্তিযুক্ত নয়। তাই লিখিত পরীক্ষা, ব্যবহারিক পরীক্ষা এবং ধারাবাহিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে একটি কার্যকর মূল্যায়ন পদ্ধতি শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা খুবই প্রয়োজন।

মাদ্রাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট

জাতীয় শিক্ষা কারিকুলাম ২০২১ এ মাদ্রাসা শিক্ষার শিক্ষার্থীদেরকে বিশেষায়িত বিষয়গুলোর সাথে স্কুল পর্যায়ের বিষয়গুলোকেও বাধ্যতামূলকভাবে পড়ার নির্দেশনা রয়েছে। মাদ্রাসা ও স্কুলের পাঠ্যবইয়ের ৯টিকেই অভিন্ন করা হয়েছে, ফলে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হয়েছে। ফলে, ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণির মাধ্যমিক স্কুলে ১০টি বিষয় হলেও দাখিল ৬ষ্ঠ থেকে দাখিল ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ১৩টি বিষয়। নিম্নোক্ত সারণীতে তুলে ধরা হলো-

	স্কুল (৬ষ্ঠ-৮ম)	মাদ্রাসা (দাখিল ৬ষ্ঠ-৮ম)
১.	বাংলা	একই বই
2.	English	একই বই
৩.	গণিত	একই বই
৪.	বিজ্ঞান অনুসন্ধানী পাঠ ও বিজ্ঞান অনুশীলন বই	একই বই
৫.	ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান	একই বই
৬.	ডিজিটাল প্রযুক্তি	একই বই
৭.	স্বাস্থ্য সুরক্ষা	একই বই
৮.	জীবন ও জীবিকা	একই বই
৯.	শিল্প ও সংস্কৃতি	একই বই
১০.	ধর্ম শিক্ষা	কোরআন মাজিদ ও তাজবিদ
১১.		আল আকায়েদ ওয়াল ফিকহ
১২.		আল লুগাতুল আরাবিয়াতুল ইত্তেসালিয়া
১৩.		কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ

একইসাথে স্কলের ৯ম শ্রেণিতে ১০টি বিষয় পড়ানো হলেও দাখিল ৯ম শ্রেণিতে পড়ানো হয় ১৪টি বিষয়। যা নিম্নোক্ত সারণীতে তুলে ধরা হলো-

	স্কুল (মাধ্যমিক-৯ম)	মাদ্রাসা (দাখিল-৯ম)
১.	বাংলা	একই বই
২.	English	একই বই
৩.	গণিত	একই বই
৪.	বিজ্ঞান অনুসন্ধানী পাঠ ও বিজ্ঞান অনুশীলন বই	একই বই
৫.	ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান	একই বই
৬.	ডিজিটাল প্রযুক্তি	একই বই
৭.	স্বাস্থ্য সুরক্ষা	একই বই
৮.	জীবন ও জীবিকা	একই বই
৯.	শিল্প ও সংস্কৃতি	একই বই
১০.	ধর্ম শিক্ষা	কোরআন মাজিদ ও তাজবিদ
১১.		হাদিস শরিফ
১২.		আল আকায়েদ ওয়াল ফিকহ
১৩.		আল লুগাতুল আরাবিয়াতুল ইত্তেসালিয়া
১৪.		কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ
১৫.		ইসলামের ইতিহাস

স্কুল ও মাদ্রাসা বাংলাদেশের দুটি স্বতন্ত্র শিক্ষা ধারা, সুতরাং এ দুটি ধারার স্বকীয়তা বজায় রাখার স্বার্থে পৃথক পাঠ্যবই রচিত হওয়া উচিত। একইসাথে শিক্ষার দুটি ধারা হলেও শিক্ষার স্তর, সময় এবং সার্টিফিকেট বিবেচনায় একই হওয়ায় পাঠ্য বিষয়ের সংখ্যাও একই হওয়াই যুক্তিযুক্ত। অথচ ২০২১ সালে শিক্ষা কারিকুলামে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরকে স্কুল পাঠ্য বিষয়সমূহকে বিবেচনাহীনভাবে বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে পাঠ্যবিষয়ে স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষায় স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়নি।

সুপারিশ

বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান স্কুল ও মাদ্রাসায় একীভূত থাকলেও মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা রক্ষায় বিশেষায়িত বিষয়সমূহে গুরুত্বারোপ করা উচিত। তবে স্কুল ও মাদ্রাসায় পাঠ্য বিষয়ের সংখ্যা একই থাকা বাঞ্ছনীয়। একইসাথে স্কুল ও মাদ্রাসার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ঠ্য বিবেচনায় মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ের চাহিদার আলোকে স্বতন্ত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। দাখিল ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ১০টি নিম্নরূপ হতে পারে- ১. বাংলা (১ম ও ২য়), ২. ইংরেজি (১ম ও ২য়), ৩. গণিত, ৪. বিজ্ঞান, ৫. বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, ৬. আইসিটি, ৭. কোরআন মাজিদ ও তাজবিদ, ৮. আল আকায়েদ ওয়াল ফিকহ, ৯. আল লুগাতুল আরাবিয়াতুল ইত্তেসালিয়া, ১০. কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ। দাখিল ৯ম-১০ম শ্রেণিতে ১১টি বিষয় হতে পারে- মানবিক বিভাগ- ১. বাংলা (১ম ও ২য়), ২. ইংরেজি (১ম ও ২য়), ৩. গণিত, ৪. বিজ্ঞান, ৪. আইসিটি, ৫. কোরআন, ৬. হাদিস, ৭. ফিকহ, ৮. আল লুগাতুল আরাবিয়াতুল ইত্তেসালিয়া, ৯. কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, ১০. ইসলামের ইতিহাস, ১১. পৌরনীতি/ভূগোল; বিজ্ঞান বিভাগ- ১. বাংলা (১ম ও ২য়), ২. ইংরেজি (১ম ও ২য়), ৩. গণিত, ৪. পদার্থ, ৫. রসায়ন, ৬. জীববিজ্ঞান/ উচ্চতর গণিত, ৭. কোরআন, ৮. হাদিস, ৯. ফিকহ, ১০. আল লুগাতুল আরাবিয়াতুল ইত্তেসালিয়া, ১১. কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ।

মন্তব্যঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ণ দেখভালের জন্য নামমাত্র মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ থাকলেও মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত অভিজ্ঞব্যক্তিদের এ পদে পদায়ন না করা এ সমস্যার একটি বড় কারণ।

উপসংহার

পাঠ্যপুস্তক আদর্শ জাতি গঠনের প্রধান হাতিয়ার। পাঠ্যপুস্তক থেকে পরিশুদ্ধ জ্ঞানের ধারা শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রবাহিত হয়। বাংলাদেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড' এর অধীনে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। দেশের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার এ উন্নয়নে এটি একটি কার্যকর পদক্ষেপ। বাংলাদেশ সরকার জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ এর আলোকে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত

পাঠ্যপুস্তক বিতরণের পর সারা দেশে ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হয়। ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে কটূক্তি, অযাচিত বিষয়ের সংযুক্তি, ইসলাম ও মুসলমানদের সংস্কৃতিকে অত্যন্ত সচেতনভাবে মুছে ফেলার প্রয়াস, বিজ্ঞান নিয়ে বিভ্রান্তি ইত্যাদি পরিলক্ষিত হওয়ার পর দেশের নানা প্রান্ত থেকে লেখালেখি শুরু হয়। ফলে নতুন পাঠ্যপুস্তক বাতিল ও পুনঃলিখনের দাবি উঠে। পাঠদান করতে গিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়ে যায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। ইতোমধ্যে বিভিন্ন দাবির মুখে সরকার জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ বাতিল করে শিক্ষাক্রম ২০১২ এ ফিরে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এ মূল্যায়ন পদ্ধতি, মাদ্রাসা স্বাতন্ত্র্য অরক্ষিত এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইসলাম শিক্ষাকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে নেওয়ার সুযোগ না থাকাসহ বিভিন্ন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে নির্মোহভাবে পর্যালোচনা করে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক এবং পরীক্ষা পদ্ধতিতে যেসকল বিতর্কিত বিষয়াবলি বিদ্যমান ছিল, তা চিহ্নিত করে মন্তব্য ও সুপারিশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা প্রয়োজনীয় ছিল, যেন ভবিষ্যতে এমন কোন ঘটনা পুনরাবৃত্তি না হয় এবং আহুত শিক্ষাক্রমে বিদ্যমান ত্রুটি সংশোধন এবং ইসলাম ও মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি অবহেলার চিহ্ন না থাকে।

Bibliography

Abul Hossain, Itihash o Samajik Biggan (Shoptom Shreni) (Dhaka: Jatiyo Shikkhakram O Patyapustak Board, 2023).

Abul Momen, Itihash o Samajik Biggan (Nobom Shreni) (Dhaka: Jatiyo Shikkhakram O Patyapustak Board, 2024).

Abul Momen, Itihash o Samajik Biggan (Oshtom Shreni) (Dhaka: Jatiyo Shikkhakram O Patyapustak Board, 2024).

Abul Momen, Itihash o Samajik Biggan (Shastho Shreni) (Dhaka: Jatiyo Shikkhakram O Patyapustak Board, 2023).

Adhyapak Dr. M. Tariq Ahsan o Onnanno, Digital Projukti (Shastho Shreni) (Dhaka: Jatiyo Shikkhakram O Patyapustak Board, 2023).

Ahmed, Moshtaq. "Notun Shikkhakrome Porikkha Noy, Mulayan Hocche 'Utshob' Kore" *Prothom Alo*, 22 June, 2023. https://www.prothomalo.com/education/examination/3egia4p2mn

Jatiyo Shikkhakram 2012, (Dhaka: Jatiyo Shikkhakram O Patyapustak Board, 2012).

Madhyamik O Uccho Shikkha Bibhag, Poripatra, Bishoy: Jatiyo Shikkhakram-2022, Notun Pustok O Choloman Mulayayan Poddhoti Songkranto Joruri Nirdeshona Prodan, September 1, 2024.

Manjur Ahmed, Shilpo o Songskriti (Oshtom Shreni) (Dhaka: Jatiyo Shikkhakram O Patyapustak Board, 2023).

Manjur Ahmed, Shilpo o Songskriti (Shastho Shreni) (Dhaka: Jatiyo Shikkhakram O Patyapustak Board, 2022).

Manjur Ahmed, Shilpo o Songskriti (Shoptom Shreni) (Dhaka: Jatiyo Shikkhakram O Patyapustak Board, 2023).

Mo. Murshid Akhter, Jibon o Jibika (Shastho Shreni) (Dhaka: Jatiyo Shikkhakram O Patyapustak Board, 2023).

Mo. Murshid Akhter, Jibon o Jibika (Shoptom Shreni) (Dhaka: Jatiyo Shikkhakram O Patyapustak Board, 2023).

Nasima Akhter o Onnanno, Swasthya Suraksha (Oshtom Shreni) (Dhaka: Jatiyo Shikkhakram O Patyapustak Board, 2024).

Nasima Akhter o Onnanno, Swasthya Suraksha (Shastho Shreni) (Dhaka: Jatiyo Shikkhakram O Patyapustak Board, 2023).

Nasima Akhter o Onnanno, Swasthya Suraksha (Shoptom Shreni) (Dhaka: Jatiyo Shikkhakram O Patyapustak Board, 2023).

Shahidullah Sharif. “Textbook Study VS Guidebook and Rote Memorization” *Bangladesh Shikkha Samoyiki*, Agrahayan-Poush, 1422, Dec. 2015.

Tariq Manzur o Onnanno, Bangla (Shastho Shreni), (Dhaka: Jatiyo Shikkhakram O Patyapustak Board, 2023).

Tariq Manzur o Onnanno, Bangla (Shoptom Shreni), (Dhaka: Jatiyo Shikkhakram O Patyapustak Board, 2023).